بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৬ মার্চ, ২০২৬ মোতাবেক ০৬ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.) যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো– এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর তওহীদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো, আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকার আদায় করা এবং অভিন্ন জাতিসত্তা হিসেবে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু আজ আমরা মুখে কলেমা পাঠ করার এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'– এই বিশ্বাস পোষণ করার দাবি করলেও বাস্তবে আমরা বহুধা বিভক্ত; আমাদের মাঝে কোনো ঐক্য নেই। যে মহান শিক্ষার ধারক-বাহক হবার দাবি আমরা করি, আমাদের কর্মের সাথে তার কোনো মিল নেই। মুসলিম বিশ্বের বর্তমান গভীর উদ্বেগজনক অবস্থা এরই ফলাফল বৈ-কি। অথচ অনেক মুসলিম দেশের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিত্তবৈভব রয়েছে; তা সত্ত্বেও বিশ্বশক্তির দরবারে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো মর্যাদা নেই। ধর্মের উন্নতির জন্য তাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা দেখা যায় না এবং ইসলামী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যে ত্যাগ ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তাও পরিলক্ষিত হয় না। এর ফলাফল অত্যন্ত স্পষ্ট– অন্যরা এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। এ কথা আমি আগেও বহুবার বলেছি।

অতএব, মুসলিম সরকার, রাজনীতিবিদ ও রাজতন্ত্রগুলোর উচিত নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পরিবর্তে মিল্লাতে ইসলামিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। তবেই আমরা বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাব, নিজেদের সম্মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারব এবং ইসলাম-বিরোধী অপশক্তিগুলোকে আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে পারব। এ উদ্দেশ্যে আমাদের এটিও ভাবা উচিত যে, এই যুগে আল্লাহ্ তা'লা (উম্মতের কল্যাণে) কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এমন কোন ঐশী ব্যবস্থা রয়েছে যার সাথে সম্পৃক্ত হলে বা যাকে গ্রহণ করলে আমরা বর্তমান বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হতে পারি? সেই ঐশী ব্যবস্থা হলো– তিনি এই যুগে উম্মতের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে প্রেরণ করেছেন।

সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে গুরুত্বের সাথে চিন্তা করা উচিত। ইসলামী দেশ ও সাধারণ মুসলমানরা যদি বিষয়টি নিয়ে ভাবেন, তবেই তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দেওয়া ষড়যন্ত্রমূলক নৈরাজ্য ও অশান্তি থেকে রক্ষা পাবেন। যা-ই হোক, আমাদের আহমদীদের প্রচেষ্টা ও দোয়া হলো– আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করুন এবং বর্তমানে তারা যে নৈরাজ্য ও অত্যাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, তা থেকে তাদের রক্ষা করুন।

বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি দীর্ঘকাল ধরে সতর্ক করে আসছি। শুরুতে মনে করা হতো, কেবল ইউরোপ বা পশ্চিমা দেশগুলোই এই অস্থিরতার মূল কারণ। তারা অবশ্যই দায়ী, কিন্তু মুসলিম দেশগুলোও এর দায় এড়াতে পারে না। এ উদ্দেশ্যে পশ্চিমা শক্তিগুলো প্রথমে ইসলামী দেশগুলোতে অস্থিরতা-অশান্তি সৃষ্টি করেছে, এরপর আগুনে ঘি ঢেলে ধীরে

ধীরে তা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এর নেপথ্যে তাদের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। তারা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দখল ও নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আর নিজেদের ব্যবহারাধীন করতে চায়। আমি পূর্বেই বলেছি, অনেক আরব দেশের অগাধ ধনসম্পদ থাকলেও পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের পদানত করে রেখেছে। যে কথাগুলো আমি বাইরের লোকদের ও আপনজনদের সামনে বলে আসছি আজ সেই দীর্ঘদিনের আশঙ্কাই বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, দাজ্জালী অশুভ শক্তিগুলো কখনোই মুসলমানদের শান্তি ও স্বস্তিতে দেখতে চায় না; মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা জিইয়ে রাখাই তাদের মূল এজেন্ডা। যে-সব আরব দেশে তেল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, পশ্চিমা শক্তিগুলো দীর্ঘকাল ধরে তাদের এই বলে ধোঁকা দিয়ে আসছে যে, 'আমরা শান্তি রক্ষার জন্য তোমাদের সাথে চুক্তি করছি'। কিন্তু বাস্তবে তাদের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন, যা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

তাই আজ আমাদের প্রধান কাজ হলো মহান আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষভাবে বিনত হওয়া এবং মুসলিম বিশ্বের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা; এটি এখন যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সামনে আসে; তা হলো, আমেরিকা অনেক মুসলিম দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। প্রশ্ন জাগে– কেন? এগুলো কি সত্যিই সেই দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য? এই আরব দেশগুলোর জন্য হুমকি আসলে কার পক্ষ থেকে ছিল? বাস্তবে এই অপশক্তিগুলো নিজেরাই ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এক অলীক ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, 'তোমরা বিপন্ন, তাই তোমাদের সুরক্ষার জন্য আমাদের সামরিক ঘাঁটি প্রয়োজন'! অথচ যাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রকৃত আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে এই শক্তিগুলো কখনোই অস্ত্র ধরবে না। অথবা মুসলমানদের এই বলে প্রলুব্ধ করা হয়েছে যে, 'আমাদের ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিলে আমরা তোমাদের স্বার্থ রক্ষা করব এবং বাণিজ্যের পথ সুগম করে দেবো।' প্রকৃতপক্ষে অত্রাঞ্চলে নিজেদের বিরোধী শক্তিগুলোর মোকাবিলায় নিজেদের উপস্থিতির দৃঢ় ভিত বজায় রাখাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। আরব দেশগুলোর যদি কোনো বিপদ থেকেও থাকে, তবে তা এই পরাশক্তিগুলোরই সৃষ্ট; অন্যথায় মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে তেমন কোনো গুরুতর সংঘাতের কারণ ছিল না।

মূলত, এই পরাশক্তিগুলো এ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার হীন উদ্দেশ্যে এসব ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তারা মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দিতে চায়। ইরান বরাবরই তাদের চক্ষুশূল, আর কিছু মুসলিম দেশও ধর্মীয় মতভেদের বাতাবরণে ইরানের বিরোধী; পরাশক্তিগুলো এই বিভেদকেই লুফে নিয়েছে। যেহেতু ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ইরানের অবস্থান তুলনামূলকভাবে অনমনীয়, তাই তারা আরব দেশগুলোকে বশীভূত করে সেখানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের ফন্দি আঁটে যেন ইসরাঈলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। অধিকন্তু ইরানকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখার জন্যও তাদের উপস্থিতি আবশ্যক। এর স্বাভাবিক ফলাফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি– এসব ঘাঁটির উপস্থিতির কারণেই আরব দেশগুলোর ওপর হামলার আশঙ্কা ছিল, তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে এবং তাদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তেল সম্পদ ও পর্যটন খাতের ওপর এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে লাভবান হয়েছে মূলত ওই পরাশক্তিগুলোই আর ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। যখন যুদ্ধ হয় এবং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপক্ষও পাল্টা আঘাত করে এবং অন্যদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার

চেষ্টা করে। যেহেতু তারা ইরানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাই ইরানও সেটিই করেছে যা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ আরব দেশগুলোতে অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে এবং সেগুলো ধ্বংস করেছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

একজন আরব সাংবাদিক সম্প্রতি লিখেছেন, আরবদের সতর্ক থাকা উচিত; কারণ যে-সব হামলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে– ইরান করছে, তা বাস্তবে ইরান করছে না; এগুলো হয়ত আমেরিকা বা ইসরাঈল নিজেরাই ঘটাচ্ছে। শুরুতে ইরান কিছু হামলা করলেও পরবর্তীতে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা নিজেরাও এমন নাশকতা করে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কিছু হামলার দায় ইরান অস্বীকারও করেছে। সেই সাংবাদিক এমনও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, হতে পারে– একসময় আমেরিকা ও ইসরাঈল এই যুদ্ধ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নেবে আর মুসলিম বিশ্ব নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকবে, যা মূলত তাদের আকাঙ্ক্ষা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ইরাক যুদ্ধের সময়ই সতর্ক করেছিলেন, এই বিশৃঙ্খলা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। হায়! মুসলিম বিশ্ব যদি এটি উপলব্ধি করত! পর্যালোচনা করে দেখুন, ইরাক যুদ্ধের পর একে একে অন্যান্য মুসলিম দেশেও অশান্তি ছড়িয়ে দেবার অপচেষ্টা হয়েছে, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। (অর্থাৎ) অন্যান্য মুসলমান দেশেও ক্রমাগত অশান্তি দেখা দেয়, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমরা জানি, আজ অনেক মুসলিম দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে। আমি যেভাবে বললাম, এই অস্থিরতা পশ্চিমা বিশ্বেরই সৃষ্ট, যা থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না; একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ নিয়তি প্রকাশ পেলে ভিন্ন কথা। তবে এর জন্য মুসলমানদের নিজেদেরও চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য আমাদের সার্বক্ষণিক দোয়া করে যেতে হবে যেন আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম বিশ্বকে এই অশান্তি ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করেন এবং নিরাপদ রাখেন। মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলমানদের উচিত, তারা যেন শান্তিপ্রিয়ভাবে ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে জীবন অতিবাহিত করে; এটাই ইসলামী শিক্ষা। তারা একে অন্যের রক্তপাত ঘটাবে– এটি কাম্য নয়।

সুতরাং অন্যায়-অবিচার থেকে আপন-পর সবাইকে নিবৃত্ত রাখা এবং সতর্ক করাই আমাদের কাজ আর দীর্ঘকাল থেকে আমরা এ কাজ করে আসছি। বর্তমানে যেভাবে নিপীড়ন বাড়ছে, তাতে মনে হচ্ছে একটি বড়ো আকারের বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। কোনো কোনো পশ্চিমা বিশ্লেষক তো বলছেনই যে, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে; আমিও মনে করি তা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও যদি মুসলিম বিশ্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, সচেতন হয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং পরস্পর সহমত হয়, তাহলে তারা এখনও দাজ্জালের নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখুন! (বিশ্ব) এখন অনেক বড়ো বিপর্যয়ের সম্মুখীন। যেমনটি আমি আগেও বলেছি, প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করছে; আর যখন চরম পর্যায়ের স্বার্থপরতা মাথায় ভর করে তখন মানুষ আর অন্য কিছু চিন্তা করে না, কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবে। অতএব, আমাদের এটি দেখতে হবে, বিশ্বে যদি অশান্তি কমাতে হয় তবে কেবল নিজের অধিকার আদায় করে তা সম্ভব নয়, বরং অধিকার প্রদান করতে হবে।

মুসলিম বিশ্ব যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করে তবে পশ্চিমা বিশ্ব ও পরাশক্তিগুলোর মাঝে বিদ্যমান তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বলতে হবে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদেরকেও

কিছু অধিকার ছাড়তে হবে। সত্য কথা হলো, অধিকার ছাড়া দূরের কথা, তারা তো নিজেরাই অন্যদের অধিকার হরণ করছে। তাদেরকে এটি বোঝাতে হবে যে, তোমাদেরকেও ন্যায়নীতির পন্থা অনুসরণ করতে হবে, কেবল তবেই আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব। এর জন্য আমি দীর্ঘকাল ধরে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। যে-সব লোক তখন আমার কথা শুনে বলত– **'আপনি বিশ্ব সম্পর্কে চরম হতাশাজনক কথা বলেন, নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন যে, বিশ্ব এক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে'–** আজ তারা নিজেরাই বলতে শুরু করেছে, 'কয়েক বছর আগেও যে বিষয়টিকে আমরা অসম্ভব বলে মনে করতাম, এখন সেই বিষয়টিই সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে আর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে'। আমেরিকা ও ইউরোপে বসবাসকারী তাদের নিজেদের বিশ্লেষকরাই এখন একথা লিখতে শুরু করেছে যে, বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি আর এটি বাড়তেই থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এরা নিজেদের অন্যায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, ততক্ষণ এই আশঙ্কা হ্রাস পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এখন মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ হচ্ছে, বাহ্যত এই যুদ্ধ ইরানের ওপর আমেরিকার হামলা করার মাধ্যমে শুরু করেছে; কিন্তু ইরান আগেই স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল– আমাদের ওপর যদি হামলা হয়, তবে আরব দেশগুলোতে বিদ্যমান আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিতে আমরা হামলা করব যা তারা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছে। আর এখন সেই উদ্দেশ্য তারা চরিতার্থও করছে; ইরান বারংবার এটি স্পষ্ট করেছে। যুদ্ধ শুরু হলে ইরানের ওপর বোমাবর্ষণ করা হয়, তাদের শহরগুলোকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করা হয়, নিরীহ জনগণ এবং শিশুদের হত্যা করা হয়, তাদের আধ্যাত্মিক নেতার বাসভবনে হামলা চালানো হয়, তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের জীবনাবসান ঘটানো হয়। এই অপশক্তিগুলোর ধারণা ছিল এবং তারা এই স্লোগান দিত যে, আমরা এই 'রেজিম' বা শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটালে ইরানীরা স্বাধীনতা লাভ করবে! কিন্তু (বাস্তবে) এর ফলাফল ভিন্ন প্রকাশ পেয়েছে। যারা কিছুটা বিরোধিতা করত, তারাও এখন তাদের পক্ষে এসে গেছে। আর (তাদের মতে) তাদের নেতা খামেনাই সাহেব শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন, আর একারণে জাতির কাছে তাঁর সম্মান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর সন্তানদের সহ পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। অতএব, অন্যায় অবিচারের মাধ্যমে শাসক পরিবর্তনের পরিকল্পনা সফল হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

যাহোক, ইরানও প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আরব দেশগুলোতে অবস্থিত পশ্চিমা ও আমেরিকান ঘাঁটিগুলোতে হামলা করেছে। এছাড়া তেলের খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল বা এমন কিছু স্থানও রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমেরিকা এই হুমকি দিতে আরম্ভ করে যে, ইরান যদি সৌদি আরবের অমুক তেলসমৃদ্ধ এলাকায় আক্রমণ করে, তাহলে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব। কিছু জায়গার সম্পর্কে বলেছেও যে, ইরান হামলা করেছে, তাই আমরা এই পাল্টা ব্যবস্থা নেব। এর উত্তরে ইরান স্পষ্ট করেছে, আমরা এমন জায়গায় কোনো আক্রমণ করি নি আর আমাদের এমন হামলার পরিকল্পনাও নেই। মুসলমানদের হৃদয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করার এটি আরেকটি ষড়যন্ত্র। যুদ্ধ তো আগে থেকেই হচ্ছে, এমন কথা বলা এই ঘৃণাকে কেবল আরো উসকে দেবারই একটি অভিসন্ধি। আমি পূর্বেই একজন সাংবাদিকের বিবৃতি উপস্থাপন করেছি; তিনি বলেছেন, হতে পারে– **এরা নিজেরাই ক্ষতিসাধন করে ইরানের ওপর দোষ চাপিয়ে দেবে।**

যেমনটি আমি বলেছি, এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আহমদীরা অন্তরে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও নিরুপায়, আমরা (আহমদীরা) অপারগ। আমরা কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারি, তাদের জন্য দোয়া করতে পারি এবং এই কথাটি বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি যে, যা হচ্ছে তা অন্যায় হচ্ছে। মুসলমান সরকারগুলো যদি এখনও বিষয়টি অনুধাবন করে, কেবল নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থই না দেখে বরং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থকে অগ্রগণ্য করে আর কোনো প্রকার বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত না হয়– তাহলে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোকেই নিন, যদিও তাদের কয়েকটির কাছে তেলসম্পদ রয়েছে, কিন্তু তাদের কোনো প্রতিরক্ষামূলক সক্ষমতাও নেই, কিংবা তাদের দেশে শিল্পেরও বিকাশ ঘটে নি। কেবল তেলের সম্পদ দিয়ে বা কোনো কোনো জায়গায় পর্যটন শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হতে পারে না। তারা শতভাগ নির্ভর করে পশ্চিমা বিশ্ব ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর ওপর। যেমনটি আমি বলেছি, তাদের এই দুর্বলতার সুযোগকে লুফে নিয়ে পশ্চিমা শক্তিগুলো সেখানে নিজেদের (সামরিক) ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এরপর যখন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়, তখন ইরানও আরব দেশগুলোর ওপর আক্রমণ করে। বাস্তবে আরব দেশগুলোর ওপর হামলা করে নি, বরং মার্কিন ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। কিন্তু এখন আরবদের এটি বুঝানো হচ্ছে যে, 'তোমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে!' এটি স্পষ্ট, এখন এই যুদ্ধ এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। ইরানের পক্ষ থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করা হচ্ছে, সেগুলোকে ইন্টারসেপ্ট (বা মাঝপথে ধ্বংস) করার জন্য আমেরিকানরা নিজেদের একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে বটে, কিন্তু বিশ্লেষকরা এখন একথা লিখছেন, ইরান যদি পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটি মিসাইল নিক্ষেপ করে, সেটিকে অকেজো করতে যা ব্যয় হয় অর্থাৎ যে মিসাইলগুলো সেটি প্রতিহত করে– তার মূল্য কয়েক মিলিয়ন ডলার। কোনো কোনো বিশ্লেষক লিখছেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমেরিকা, কিন্তু এটি নিছক একটি ধারণা মাত্র। এই শক্তিগুলো আগে থেকেই প্রতিটি জিনিসের হিসাব কষে নেয় এবং পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করে। তারা পূর্ব থেকেই সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছে। আমি মনে করি না– এরা নিজেরা এই ঘাটতি পূরণ করবে; বরং তারা এই অর্থ আরব দেশগুলোর কাছ থেকেই এই অজুহাত দেখিয়ে আদায় করবে যে, 'আমরা তোমাদের সুরক্ষা করছি!' একদিকে তাদের তেলের কূপগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তেলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে; অন্যদিকে তাদের এই ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। এর ফলে তাদের রিজার্ভ অনেক কমে যাবে বা ফুরিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত আরব বিশ্বের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর কিছুটা ক্ষতি হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আরব বিশ্ব। এই বিষয়টি তাদের এখনই বোঝা উচিত।

এখন আমরা দেখছি, আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট তার পূর্ববর্তী সরকারগুলোর নীতিকেই বাস্তবায়ন করছে। এটি কেবল বর্তমান সরকারের নীতি নয়, বরং তাদের নীতি সবসময় এটিই ছিল; অর্থাৎ 'যেখানে মন চায় সেখানকার সম্পদ জবরদখল করে নাও, এরপর সেটিকে বৈধতা দেবার জন্য এমর্মে (খোঁড়া) যুক্তি দাঁড় করাও যে, 'অমুক কারণে বা তমুক কারণে এটি করা হয়েছে'। বরং সম্প্রতি আমেরিকার বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট তো এটিও বলে বসেছে যে, 'অমুক দেশ যদি আমাদের সঙ্গে যোগ না দেয়, তবে আমরা জোরপূর্বক তাদের সম্পদ করতলগত করব এবং তাদেরকে আমাদের দলভুক্ত করে ছাড়ব!'

যে-সব দেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, স্যাংশন আরোপ করা হয়।

কিছুদিন পূর্বে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সাহসিকতার সঙ্গে বলেছিলেন, 'আমরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না এবং আমাদের বিমান ঘাঁটিও ব্যবহার করতে দেবো না'। তখন তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়, 'আমেরিকা তোমাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে'। এভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে ও অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে বিভিন্ন দেশ এবং দেশের মানুষকে তাদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে তো ন্যায়নীতির আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। আর যখন ন্যায়বিচার থাকে না, তখন ধ্বংস নেমে আসে এবং এমন ভয়ংকর ফলাফল প্রকাশ পায় যা এখন দেখা যাচ্ছে; বরং এরচেয়েও ভয়াবহ ও ভীতিকর ফলাফল ভবিষ্যতে দেখা দেবে। কিছুদিন আগে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে তাদের একজন স্প্যানিশ নারী সাংসদ খুব স্পষ্টভাবে বক্তব্য দিয়ে বলেছেন, 'আমেরিকার কোনো যুদ্ধের ফলে নারীরা কখনও স্বাধীনতা পায় নি'। তিনি একজন নারী হিসেবে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমেরিকানদের বুলিসর্বস্ব যে দাবিটি রয়েছে যে, আমরা ইরানের নারীদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি– এটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা; এর মাধ্যমে কখনও ইরানী নারীরা স্বাধীনতা পাবে না; বরং আমেরিকা কখনও কোনো নারীর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেও নি এবং কাউকে স্বাধীনতা দিতে সক্ষমও হয় নি।

যাহোক, সারকথা হলো, এই দেশগুলোতে যদিও আগে থেকেই বলা যায় আমেরিকার অনেকটা আধিপত্য ছিল, এখন এতে প্রকাশ্যে ইসরাঈলকে যুক্ত করে সেই আধিপত্যকে আরো সুদৃঢ় করা হচ্ছে।

আরব ও ইসলামী দেশগুলো একথা বোঝে না যে, বলপ্রয়োগ, ভয়ভীতি এবং দাজ্জালী কৌশলে আমাদের এমন এক জালে ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেখানে আমরা নিজেরাই একটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ানো হচ্ছে। এখন রাশিয়া ও চীনও জোট গঠন করছে। আর এটি তো স্পষ্ট, যে-সব জোট তৈরি হচ্ছে– ভবিষ্যতে এগুলো আরো বিস্তৃত হবে এবং এর অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকবে, এগুলো আরো দৃঢ়তা লাভ করবে। ইসলামী বিশ্ব এখন যুদ্ধক্ষেত্র, কারণ তাদের কাছে এমন সম্পদ রয়েছে যা এসব পরাশক্তি দখল করতে চায়। হায়! মুসলমানরা যদি এই বিষয়টি বুঝত এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত! আমেরিকা ও তার সহযোগী বলছে– 'ইরানের অমুক অভিসন্ধির কারণে আমরা তাদের ওপর হামলা করেছি; যদি সে এটি করত তবে এমনটি হয়ে যেত, পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ফেলত বা অমুক ঘটনা ঘটে যেত।' শুধু একটি ধারণার ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। এটি তো আদ্যোপান্ত একটি জবরদস্তিমূলক কথা। এখন তো খোদ পশ্চিমা বিশ্লেষকরাও বলতে শুরু করেছেন– ইরানকে ধ্বংস করা বা তার সঙ্গে যুদ্ধ করা এতটা সহজ নয়, যতটা তারা ভাবছিল। ইরান একটি বড়ো ও বিস্তীর্ণ দেশ। তারা কিছুটা হলেও শক্তি রাখে আর এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। যদিও বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব পড়বে, কিন্তু মুসলিম বিশ্বের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব হবে অনেক বেশি। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, এতে মুসলমানই মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছে। মুসলমানদের আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির ভয় করা উচিত। শত শত শিশু হত্যা করা হয়েছে, শত শত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেক কলাম লেখক এখন লিখছেন– ইসরাঈল, আমেরিকা বা অন্য কোনো পশ্চিমা দেশে যদি আক্রমণ হয় এবং আমাদের কয়েকজন শিশু মারা যায়, তাহলে সংবাদপত্রে কলামের

পর কলাম লেখা হয় এবং দিনের পর দিন লেখা অব্যাহত থাকে। কিন্তু এখানে (তথা ইরানে) একটি স্কুলে বোমা হামলা করে শত শত শিশুকে হত্যা করা হলো, কিন্তু সেখানে টুঁ শব্দটি করারও কেউ নেই। প্রথমে ফিলিস্তিনে এই ঘটনা ঘটিয়েছে, আর এখন ইরানেও একই ঘটনা ঘটছে। মনে হয় যেন তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানের জীবনের কোনো মূল্যই নেই।

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের শুভবুদ্ধি দিন যেন তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় এবং পরস্পর বসে মিলেমিশে সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে। তারা যেহেতু তওহীদে বিশ্বাসী হবার দাবি করে তাই তাদের উচিত তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া। অকারণে দোষারোপ করে ঝগড়া সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু এ কথা বলে দেওয়া যে, 'অমুকের বিশ্বাসের কারণে ঝগড়া বাড়ছে'; এটি সঠিক যে, অনেক সময় আকীদার কারণেও ঝগড়া হয়, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যে দ্বন্দ্ব রয়েছে– তার পেছনে এটিও একটি কারণ; অথচ মহানবী (সা.) এত সতর্ক এবং এত দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন যে, সাহাবীরা কখনও কখনও তাঁর সামনে বলতেন– 'অমুক ব্যক্তি মুনাফিক', তখন তিনি (সা.) বলতেন, 'যতক্ষণ সে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** পড়ে, আমি তাকে কিছু বলতে পারি না এবং তোমরাও তাকে মুনাফিক বোলো না'।

অতএব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা আসলে নিজেদেরই ক্ষতি করার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম বিশ্বকে এক্ষেত্রেও বিবেক খাটানোর তৌফিক দিন। এখনও সময় আছে, তাদের বিষয়টি বুঝতে হবে। শুধু আকীদাগত মতভেদের কারণে ইরানের বিরোধিতা করা উচিত নয়। তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম (পৃথিবীতে) এসেছে, তাই তওহীদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। পরাশক্তিগুলোকে নিজেদের খোদা জ্ঞান করবেন না, কারণ চিরস্থায়ী ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই। এই পরাশক্তিগুলোকেই যদি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়, তাহলে এরা একে একে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে নিজেদের দখলদারি কায়েম করবে এবং নামেমাত্র যে সরকারগুলো রয়েছে, সেগুলোও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

অতএব এখনও সময় আছে, সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিনত হোন। এসব জগৎপূজারী পৃথিবীর শান্তি ও স্থিতি, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের শান্তি ধ্বংস করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (সূরা আল-হুজুরাত: ১০)

অর্থাৎ, যদি মু'মিনদের দুটি দল পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করো। যদি সন্ধি হবার পর তাদের মধ্যে একটি দল অন্যটির ওপর আক্রমণ করে, তবে সবাই মিলে সেই আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশের দিকে ফিরে আসে তাহলে ন্যায়ের সঙ্গে বিবদমান উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা করো এবং ন্যায়বিচারকে সামনে রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।

অতএব এটিই সেই চিত্র ও নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি, যা পৃথিবীর শান্তির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের এটি মেনে চলা উচিত, কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এই স্পষ্ট নির্দেশ তাদের প্রদান করেছেন। তাই ন্যায় ও ইনসাফের দাবি পূর্ণ

করুন। ইসলামী দেশগুলোর যে সংগঠন রয়েছে, তাদেরও এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা উচিত। এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত– মীমাংসা করানোর সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ সামনে রাখা যাবে না; বরং সমস্যার মূল কারণ কী– তা নির্ণয় করতে হবে। তবে বর্তমানে (সংঘাতের) কারণগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট আর তা হলো, দাজ্জালী শক্তিগুলো আমাদেরকে লড়াতে চায়। জাতিসংঘ (ইউএন) ইত্যাদি সংস্থাগুলো কোনো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে নি। বরং এখন এরা নিজেরাই এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে। আমরা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এবং নিজেদের জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে কাজ করি, তবেই আমরা রক্ষা পাব। অন্যথায় আমরা এই দাজ্জালী শক্তিগুলোর কূড়নকে পরিণত হবো। অতএব সব মুসলিম দেশের উচিত একত্রে বসে আলোচনা করা।

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা উক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (সূরা আল-হুজুরাত: ১১)

অর্থাৎ, মু'মিনরা তো (পরস্পর) ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে– যারা পরস্পর বিবদমান– সন্ধি স্থাপন করো এবং আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করো যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়।

মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলেও, যেমন বলা হয়– ইরান ও কিছু আরব দেশের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, অথবা অন্য মুসলিম দেশগুলোর মধ্যেও মতভেদ রয়েছে; এমন ক্ষেত্রেও তাদের স্মরণ রাখা উচিত, তাদের পারস্পরিক মূল সম্পর্ক হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের। ছোটোখাটো (আকীদাগত) বিবাদ এই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পদদলিত করার কারণ হওয়া উচিত নয়। মুসলিম দেশগুলোর বিশেষভাবে এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। অন্যথায়, যেমনটি আমি বলেছি– ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো এর সুযোগ গ্রহণ করবে।

অতএব আরব দেশগুলোর ও ইরানের উচিত, তারা যেন শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বের করে। চীন ও অন্য কিছু দেশ যাদের মধ্যে পাকিস্তানও রয়েছে, সমঝোতার উদ্দেশ্যে ভূমিকা রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। হায়! মুসলিম বিশ্ব যদি এই বিষয়টি বুঝতে পারত! আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দান করুন।

যাহোক, বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য এবং নিরপরাধ লোকদের জন্য দোয়া করা আমাদের কর্তব্য। রমযান মাসে শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে দোয়া করবেন না, বরং বিশেষভাবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দান করুন যেন পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, মুসলমান যেন মুসলমানের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকে। এরা নিজেদের মাঝে যুদ্ধ করে, অন্যায়ভাবে একে অপরকে হত্যা করে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধের পাত্র হচ্ছে। এমন লোকেরা শুধু এই পৃথিবীতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বরং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং এর জন্য আমাদের বিশেষভাবে দোয়া করা দরকার। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে দোয়া করার সৌভাগ্য দান করুন।

আজ আমি কয়েকজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব, কিছু প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে শ্রদ্ধেয়া সাহেবযাদী আমাতুল জামীল সাহেবার। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র সবচেয়ে ছোটো মেয়ে এবং মরহুম নাসির মুহাম্মদ সিয়াল

সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন; তিনি চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিয়াল সাহেবের পুত্রবধু ছিলেন যিনি যুক্তরাজ্যের একজন মুবাল্লিগ ছিলেন। সম্প্রতি প্রায় উননব্বই বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমা ওসিয়্যত করেছিলেন। তিনি হযরত সৈয়দা মরিয়ম বেগম উম্মে তাহের সাহেবার সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে ছিলেন, আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র সন্তানদের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৫৫ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর নিকাহ পড়িয়েছিলেন। হুযূর যেহেতু অসুস্থ ছিলেন, তাই বিছানায় শায়িত অবস্থায় নিকাহর খুতবা প্রদান করেন এবং দোয়া করান, আর পরিবারের কয়েকজন সদস্য এতে উপস্থিত ছিলেন। বর্ণনাকারী লিখেছেন, এই অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর ওপর এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা বিরাজমান ছিল। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ নিজেই ১৯৫৬ সালে দোয়া করে তাঁকে বিদায় জানান। তাঁর চারজন সন্তান রয়েছেন। তাদের প্রথমজন হলেন ছেলে যায়ের মুস্তফা, যাকে তিনি তাঁর বোন সাহেবযাদী আমাতুল কাইয়্যুম সাহেবার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং তিনি ছোটোবেলা থেকেই তাকে লালন-পালন করেন। মেয়ে ইয়াসমীন মালিক কানাডায় থাকেন, সাদিয়া আহমদ এখানে যুক্তরাজ্যে থাকেন, সোফিয়া আহমদ রাবওয়ায় আছেন আর তিনি নাযের খিদমতে দরবেশান মির্যা সামাদ আহমদের সহধর্মিণী। মুকাররম নাসির মুহাম্মদ সিয়াল সাহেব ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ যখন ফযলে উমর রিসার্চ প্রকল্প শুরু করেন তখন তাকে এই গবেষণার কাজে নিয়োজিত করেন। এরপর যখন রিসার্চ বন্ধ হয়ে যায়, তখন জামা'ত তাকে নিজের কাজ করার অনুমতি প্রদান করে।

তাঁর মেয়ে সোফিয়া লেখেন, তিনি দরিদ্রের দেখাশুনা করতেন। অন্য লোকেরাও আমাকে লিখেছেন যে, তিনি আমাদের খেয়াল রাখতেন এবং আমাদের অভাব মোচনের চেষ্টা করতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদের সাথে সম্পৃক্ত তাঁর শৈশবের কিছু ঘটনা রয়েছে; হযরত মুসলেহ্ মওউদের কিছু স্বপ্ন রয়েছে যেগুলোতে তাঁর উল্লেখ আছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর স্মৃতিচারণে কিছু পুরোনো ইতিহাসও এসে যাবে।

তিনি নিজেই একটি পারিবারিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, যা থেকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নীতিপরায়ণতা কেমন ছিল এবং জামা'তের কর্মীদের সম্মানের প্রতি তিনি কতটা সচেতন ছিলেন– তা বোঝা যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদের জুতো বাইরে রাখা থাকত, যা কর্মীরা পরিষ্কার করে দিতেন। একবার তিনি (আমাতুল জামীল সাহেবা) নিজের জুতোও সেখানে রেখে দেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জুতোটি উঠিয়ে নিয়ে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, 'এটি কার জুতো?' তিনি (রা.) রাগান্বিত ছিলেন, তাই কেউ কোনো উত্তর দেয় নি। অবশেষে তিনি বলেন, 'আচ্ছা বলো, এটি কার? আমি কিছু বলব না।' তখন তিনি (আমাতুল জামীল) বলেন, 'আমার'। স্মরণ থাকে, তিনি (আমাতুল জামীল সাহেবা) হযরত মুসলেহ্ মওউদের অত্যন্ত আদরের কন্যা ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'ভবিষ্যতে তুমি যদি নিজে জুতো পলিশ করতে না পারো তবে আমাকে দিয়ে দিও, কিন্তু জামা'তের কর্মীকে দিয়ে পলিশ করাবে না।' যাহোক, তিনি সদকা-খয়রাত করতেন এবং গরীবদের দেখাশোনা করতেন। তাঁর মেয়ে বলছেন, আমি বইপত্র থেকে তাঁর পুরোনো খাতাগুলো বের করে দেখলাম, তাতে গরীবদের সাহায্যার্থে অনেক খরচের কথা পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে, যা তিনি নিয়মিত প্রদান করতেন।

যখন তাঁর বয়স সাত বছর ছিল তখন তাঁর মাতা হযরত মরিয়ম সাহেবা (উম্মে তাহের সাহেবা) ইন্তেকাল করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, 'মরহুমাকে

নিয়ে আমরা যখন শেখ বশীর আহমদ সাহেবের বাড়িতে পৌঁছালাম, তখন ছোটো মেয়ে আমাতুল জামীল– যে তার এবং আমার অত্যন্ত আদরের কন্যা ছিল এবং যার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর– তাকে আমি দেখলাম, 'হায় আম্মি! হায় আম্মি!' বলে চিৎকার করে কাঁদছে। আমি তার কাছে গেলাম; আমরা তাকে আদর করে 'জিম্মি' ডাকতাম; আমি তাকে বললাম, জিম্মি! আম্মি আল্লাহ্ পাকের কাছে গেছেন। সেখানে তিনি বেশি আরাম পাবেন এবং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছিল– তিনি যেন সেখানে চলে যান। দেখো, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, তোমার দাদাজান ইন্তেকাল করেছেন; তোমার আম্মি কি তাঁদের চেয়ে বড়ো ছিলেন?'

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, 'আমার খোদার ছায়া এই শিশুটির শির থেকে এক মিনিটের জন্যও যেন আলাদা না হয়! আমার এই কথাটির পর সে মায়ের জন্য আজ পর্যন্ত আর কোনোদিন উচ্চবাচ্য করে নি, কাঁদে নি এবং এই কথাটি শোনামাত্রই সে একেবারে চুপ হয়ে যায়। বরং পরের দিন জানাযার সময় যখন তার বড়ো বোন শোকে চিৎকার দিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে, তখন আমার ছোটো স্ত্রী মরিয়ম সিদ্দীকার কাছে গিয়ে আমার 'জিম্মি' তাকে বলতে থাকে, 'দেখো ছোটি আপা! বাজি কত পাগল! আব্বাজান বলছেন, আম্মির মৃত্যুতে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ছিল, আর সে তবুও কাঁদছে। হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা সাহেবাকে বাচ্চারা 'ছোটি আপা' বলে ডাকত।' তারপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু! যার ছোটো শিশু তোমার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে নি, তুমি কি তাকে পরকালে সব ধরনের দুঃখকষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবে না?' এরপর তিনি হযরত মরিয়ম সাহেবার (হযরত উম্মে তাহের সাহেবার) জন্য এভাবে দোয়া করেন যে, 'হে আমার পরম দয়াময় খোদা! তোমার কাছে এমন আশা রাখা তোমার বান্দাদের অধিকার এবং এই আশা পূরণ করা তোমার মহান মর্যাদাসম্মত।'

যা-ই হোক, তিনি চাঁদা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন। ওসিয়্যত আদায়ে সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ তিনি আগে থেকেই সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে রেখেছিলেন। প্রতিবেশীদের মৃত্যুতে তাদের বাড়িতে নিয়মিত খাবার পাঠাতেন। আর সর্বদা যাতায়াতকারীদের বলতেন, আমাকেও তিনি কয়েকবার বলেছেন যে, 'দোয়া করো যেন আমার পরিণতি শুভ হয়'।

তাঁর দৌহিত্রী নুসরাত বলেন, নানী নামাযের সময় হবার আগেই প্রস্তুতি নিয়ে বসে যেতেন এবং অত্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন আর দীর্ঘ দীর্ঘ দোয়া করতেন। যাদের জন্য দোয়া করার থাকত তিনি তাদের একটি তালিকা বানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার ছোটোবেলায় আমরা নানীর দীর্ঘ এবং ক্রন্দনঘন দোয়া শুনে ঘাবড়ে যেতাম। কিন্তু যা-ই হোক, তিনি সব মানুষের জন্য দোয়া করতেন।

যেমনটি আমি বলেছি, তাঁর স্মৃতিবিজড়িত কিছু পুরোনো ঘটনা রয়েছে, হযরত মুসলেহ্ মওউদের কিছু স্বপ্নও রয়েছে। হাদী আলী সাহেব বলেন, তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, 'একবার আমি খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র সাথে গাড়িতে সফর করছিলাম, হুযূরের সাথে পিছনের সিটে বসে ছিলাম। তখন আমি দেখলাম, হযরত মুসলেহ্ মওউদ আঙুলে বার বার কিছু গুনছেন'। তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আব্বাজান, আপনি কী গুনছেন?' তখন হুযূর বলেন, 'আমি বিশ্বের সকল দেশে আমার কতজন মুবাল্লিগ দরকার তার একটি হিসেব করছি। আমার সারা বিশ্বে কমপক্ষে এত লক্ষ মুবাল্লিগ

চাই, কেবল তবেই আমরা বিশ্বকে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অবগত করতে পারব।' অতএত এটি হলো হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র ব্যাকুলতা যার কিছু বর্ণনা এর মাঝে রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদের একটি স্বপ্ন রয়েছে। যেহেতু সেটি তাঁর (আমাতুল জামীল সাহেবার) সাথে সম্পর্কিত, তাই আমি তা বর্ণনা করছি। এটি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের স্বপ্ন। তিনি (রা.) বলেন, জুন মাসে আমি সিন্ধুর নাসিরাবাদে ছিলাম। সেখানে আমি দেখলাম, একটি মিনার রয়েছে, অনেক উঁচু এবং সাদা, কাদিয়ানের মিনারের আকৃতির মতো। এর নীচের তলার ওপরের কার্নিশে দরজার কাছে আমার মেয়ে আমাতুল জামীল বসে আছে এবং অত্যন্ত সাবলীলভাবে কার্নিশ থেকে সে পা ঝুলিয়ে রেখেছে। এমন সময় আমার দৃষ্টি মিনারের ওপর পড়ল। আমি দেখলাম, মিনারের সবচেয়ে ওপরের তলায়, অর্থাৎ তার নীচের তলার দরজা থেকে সবুজ রঙের একটি অনেক বড়ো সাপ যা কয়েক গজ লম্বা এবং দেড় ফুট মোটা, সেটি মাথা বের করে নীচের তলার দিকে আসছে এবং এভাবে সে ওপর থেকে একতলা নীচে নামল। [দীর্ঘ বর্ণনা সংক্ষেপে বলছি।] এমনকি সেটি সবচেয়ে নীচের তলা থেকে একতলা ওপরে পৌঁছে গেল এবং এরপর সে নীচের তলার ছাদের দিকে মুখ ফেরাল। ওই সময় আমার মনে হলো, আমাতুল জামীল দরজার কাছে কার্নিশে বসে আছে; সাপটি আবার তাকে কামড়ে না দেয়! একই সাথে আমি ভয় পাচ্ছিলাম, যদি মেয়েটি নড়ে ওঠে তবে সে পড়ে যাবে এবং আঘাত পাবে। তখন আমি অত্যন্ত কাকুতিমিনতির সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া আরম্ভ করলাম। এর এই বাক্যটি আমার মনে আছে যে:

اللّٰهُمَّ اَعِزَّهَا لِیْ وَلِلْجَمَاعَةِ الْاَحْمَدِیَّةِ وَلِغُرَبَائِهَا

অর্থাৎ, হে আমাদের আল্লাহ্! একে আমার খাতিরে, আহমদীয়া জামা'তের খাতিরে এবং এর গরীবদের খাতিরে এই বিপদ থেকে মুক্তি দাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ লেখেন, আরবিতে 'গুরাবা' শব্দের অর্থ মুসাফিরও হয়ে থাকে এবং উর্দুতে 'গুরাবা' শব্দের অর্থ মিসকীন বা গরীব। আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন– এখানে উর্দু বাগ্‌ধারা ব্যবহার করা হয়েছে নাকি আরবি বাগ্‌ধারা ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে কিছু মুসাফিরের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। যাহোক, আমি এই দোয়া করে চললাম এবং আমি দেখলাম, আমাতুল জামীল নিজে থেকেই বিপদের আঁচ পেয়ে কার্নিশের দিক থেকে সরতে শুরু করল এবং সরতে সরতে দরজা থেকে সে কয়েক গজ দূরে সরে গেল। এর মাঝে সাপটি ওই দরজা দিয়ে নেমে জামীলের দিকে দেখল, কিন্তু যেহেতু সে কিছুটা দূরে ছিল তাই তার পিছু নিল না, বরং মাটির দিকে নামতে শুরু করল।

তিনি লেখেন, এই স্বপ্ন বাহ্যত আমার মেয়ের জন্য অত্যন্ত বরকতময়, কারণ এতে দোয়া রয়েছে। সে আমার জন্য হৃদয়ের প্রশান্তির পাশাপাশি জামা'ত এবং দরিদ্রদের জন্যও উপকারী হবে। বাকি আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

মুসলেহ্ মওউদ (রা)-র আরো কিছু স্বপ্ন রয়েছে যেগুলোতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে হল্যান্ডের ডা. রশীদ আহমদ খান সাহেবের, যিনি মুকাররম নিজামুদ্দীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি একানব্বই বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন এবং তাঁর চার ছেলে ও চার মেয়ে রয়েছে। ডা. রশীদ সাহেবের পিতা নিজামুদ্দীন

সাহেব সীমান্ত প্রদেশের সাবেক আমীর ডা. ফতেহউদ্দীন সাহেবের ছোটো ভাই ছিলেন, আর তার মাধ্যমেই তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয়।

১৯০৫ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লুধিয়ানায় একটি ভাষণ প্রদান করেন। ওই সময় ফতেহউদ্দীন সাহেব স্কুলে পড়তেন। স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে কঠোরভাবে বারণ করে রেখেছিল যে, 'কখনোই তাঁর ভাষণ শুনতে যাবে না; ইনি জাদুকর এবং তোমাদেরকে বশ করে ফেলবেন।' সর্বদা নবীদের ওপর যে অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকে– হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপরও মৌলভীরা একই অপবাদ আরোপ করত। ফতেহউদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষণ শুনতে চলে যান এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র চেহারা দেখেই ছোটো বয়সেই তার এই বিশ্বাস জন্মে যে, ইনি সত্যবাদী। অতঃপর পড়াশোনা শেষ করে ১৯১৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র যুগে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন।

মরহুম রশীদ সাহেব অত্যন্ত নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি অমায়িক, মিশুক, খোদাভীরু এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। অন্যের জন্য নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিতেন। অত্যন্ত নির্ভীক ও সাহসী, খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এবং সবসময় সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। গরীবদের ভরণপোষণ ও গোপনে অভাবীদের সাহায্য করতেন। বহু নও-মুবাঈ (নতুন বয়আতকারী) যাদের বিরুদ্ধে বিরোধীরা মিথ্যা মামলা দায়ের করত, তাদের জামিনের জন্যও তিনি চলে যেতেন এবং 'ফুরকান ফোর্স'-এও যোগ দিয়েছিলেন। তার একটি সৌভাগ্যের বিষয় হলো, তার শ্বশুর আব্বাস খান সাহেবকে এবং তার ভাই মনযুর সাহেবকে সীমান্ত প্রদেশে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ওয়াকফে জাদীদের অধীনে বিভিন্ন এলাকায় এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, পুরোনো আহমদী পরিবারগুলোর সাথে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করুন এবং তবলীগের দায়িত্ব পালন করুন। তারা এই কাজটি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

তবলীগের প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। দৌলত খাঁন সাহেব নামের এক বন্ধুকে তিনি তবলীগ করেন এবং তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। একারণে তার বিরুদ্ধে মামলা হয় আর বয়আতকারীর বিরুদ্ধেও হয় এবং তাকে গ্রেফতারও করা হয়। জামিনের জন্য কেউ সামনে আসছিল না। মুচলেকা বা জামানতনামা গৃহীত হচ্ছিল না, তাই রশীদ সাহেব নিজেই তার জামা'তাকে সাথে নিয়ে সেখানে যান। মৌলভীদের পাঁচ হাজার লোকের একটি মিছিল ছিল, তারা তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তার জামা'তার মাথায় পাথর লাগে আর তিনি পড়ে যান। তারা তাকে প্রহার করে আর সেখানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। পুলিশও এই শয়তানদের অনুসরণে এই বলে লাশে লাথি মারতে শুরু করে যে, 'আমরাও সওয়াব অর্জন করছি'; কেননা তারা (তথা মোল্লারা) পুণ্যকর্মের নামে এমনটি করে।

যাহোক, তাকেও (অর্থাৎ রশীদ সাহেবকেও) তারা বেদম প্রহার করে এবং তার শরীরের প্রায় সব হাড়ই ভেঙে দিয়েছিল। তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান, এর দাগ পরে আমিও দেখেছি; তার চেহারায় দাগ ছিল এবং হাত ইত্যাদিও ওই আঘাতের কারণেই বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করেছেন, আর তারা তাকে মারতে মারতে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে পুলিশ তাকে লাশ মনে করে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন তারা হাসপাতালের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন তিনি বলেন যে, 'আমি জীবিত আছি; আমাকে

অমুক জায়গায় পৌঁছে দাও'। যা-ই হোক, ডাক্তাররা তাকে দেখেন; তারাও আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, তিনি বেঁচে আছেন কীভাবে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জীবিত রাখতে চেয়েছিলেন, এরপর ওই আঘাতগুলো সত্ত্বেও তিনি ত্রিশ বছরের বেশিকাল জীবিত ছিলেন এবং অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন।

তিনি পুলিশকে বলেছিলেন, 'আমাকে পেশোয়ার পৌঁছে দাও;। সেখানকার পুলিশ বিরোধী ছিল আর পৌঁছানো কঠিনও ছিল। কিন্তু এতে মানুষের জন্য লাভজনক দিকও আছে। পুলিশকে টাকা দিলে কাজ হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আমার কাছ থেকে তোমরা যে পরিমাণ টাকা নিতে চাও নিয়ে নাও, তবে আমাকে পৌঁছে দাও।' যাহোক, এতে পুলিশ অফিসার সম্মত হয়, তাকে পেশোয়ার পৌঁছে দেয়। এরপর তিনি রাবওয়ায় আসেন, তার চিকিৎসা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আল্লাহ্ তা'লা তাকে নতুন জীবন দান করেন। কোথায় একসময় তাকে মৃত মনে করে মর্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, আর কোথায় আল্লাহ্ তা'লা এর পরও ত্রিশ বছর তাকে জীবিত রাখলেন এবং অত্যন্ত সক্রিয় অবস্থায় জীবিত রাখলেন।

তিনি হল্যান্ডেও বসবাস করেছেন, সেখানেও জামা'তের কাজে জড়িত ছিলেন। ১৯৭৪ সালেও শত্রুরা তার ওপর পিস্তল তাক করেছিল, তখন তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জবাব দিয়েছিলেন। মৌলভীরা বলে যে, 'কলেমা পড়ো, মুসলমান হয়ে যাও!' তিনি বলেছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ তো আমি আগে থেকেই পড়ি, এর ওপর আমার ঈমান রয়েছে; আর কীভাবে আমি মুসলমান হবো?' তারা বলে, 'না, মির্যা সাহেবকে গালি দাও।' তিনি বলেন, 'আমি তো গালি দেবো না! এটি ইসলামসম্মত নয়।' এরপর তিনি বলেন, 'আমি তো দরূদ পাঠকারী এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ওপর আমলকারী; আমি এ ধরনের কাজ করতে পারি না।'

তিনি বলেন, আমি তাদেরকে একজন সাহাবীর একটি ঘটনা শোনাই। উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়ে তখন জনৈক সাহাবী বলেছিলেন, 'আমার এবং বেহেশতের মাঝে তো কেবল একটি খেজুরই বাধা হয়ে আছে'; তিনি সেটি একপাশে ছুঁড়ে ফেলেন ও একাকী শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, আর তাঁর শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আমি তাদেরকে এই ঘটনাটি শোনাই এবং বলি, আমার আর তোমাদের মাঝে তো খেজুরও বাধ সাধছে না... বাতাসও বাধা হয়ে নেই, কারণ তোমরা আমার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে রেখেছ; তোমরা ট্রিগার চেপে দাও এবং আমাকে শহীদ করে দাও, কিন্তু আমি সেই কথা মানব না যা তোমরা বলছ, অর্থাৎ মসীহ্ মওউদকে গালি দেবার কথা। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত ও কৃপা করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয়া যয়নব বিবি সাহেবার। তিনি চক ২৭৫ কর্তারপুর জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং মসজিদের ইমাম মরহুম বশীর আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। সম্প্রতি পঁচাশি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসিয়্যত করেছিলেন। তার পিতা আলী মুহাম্মদ সাহেব ফয়সালাবাদের দারুয যিকর মসজিদের খাদেম ছিলেন। তিনি গভীরভাবে দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, নামাযে অত্যন্ত একনিষ্ঠ, প্রতিদিন পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত করতেন, অতিথিপরায়ণ, খিলাফতের প্রতি গভীর

নিষ্ঠাবতী, পুণ্যস্বভাবের এক নারী ছিলেন। গরীবদের সাহায্যও করতেন এবং জুমুআর খুতবা অত্যন্ত নিয়মিতভাবে শুনতেন; আর শুধু শুনতেনই না, বরং পরিবারের সদস্যদেরও ডেকে শোনাতেন।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার তিন ছেলে ও চার মেয়ে রয়েছে। তার কয়েকজন নাতি-নাতনি ওয়াকেফে যিন্দেগী। তার কন্যা আমাতুর রশীদ সাহেবা জাম্বিয়ার লুসাকায় কর্মরত জামা'তের মুবাল্লিগ তাহের আহমদ সাইফী সাহেবের সহধর্মিণী। তিনিও আজকাল লুসাকায় আছেন, মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি লুসাকাতেই ছিলেন। সেই মেয়েও নিজের প্রয়াত মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, যেতে পারেন নি, জানাযা দেখতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য দিন এবং মরহুমার রূহের মাগফিরাত দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)